সংবিধান সংস্কার কমিশন

ব্লক-১, জাতীয় সংসদ ভবন এলাকা, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।

১২ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে অফলাইনে প্রকাশিত সংবিধান সংস্কার কমিশন এবং অন্যান্য সংস্কার কমিশন সংক্রান্ত সংবাদ:

ক্র.নং	সংবাদ শিরোনাম	পত্রিকার নাম	মন্তব্য
১.	সংস্কার কমিটিগুলো নির্দেশনা পেতে পারে মিজানুর রহমান খানের লেখায়	দৈনিক মানবজমিন	শেষের পাতা
২.	নতুন বাংলাদেশের সংবিধান নিয়ে কিছু প্রশ্ন	দৈনিক আমার দেশ	পৃষ্ঠা: ০৬
৩.	দেশ সংস্কারের পাদটীকা	দৈনিক যুগান্তর	পৃষ্ঠা: ০৪
৪.	ডাটাবেজের তথ্য যাচাইয়ে নির্বাচন কমিশনের আপত্তি	দৈনিক আমার দেশ	শেষের পাতা
৫.	আ. লীগের নিবন্ধন থাকবে কি না সময় বলে দেবে	দৈনিক কালের কণ্ঠ	শেষের পাতা

দৈনিক মানবজমিন ১২-০১-২০২৫

সংস্কার কমিটিগুলো নির্দেশনা পেতে পারে মিজানুর রহমান খানের লেখায়

১২ জানুয়ারি ২০২৫, রবিবার

মিজানুর রহমান খান একজন ক্ষণজন্মা পুরুষ। তিনি ছিলেন সেলফ ক্রিয়েটেড পারসন। নিজেকে নিজে তৈরি করেছেন। তার সংবিধান ও আইনের লেখাগুলো এত সহজ, সাধারণ মানুষও বুঝতে পারেন। তিনি কেবল সাংবাদিক ও লেখকই নন, সংস্কারকও বটে। অন্তর্বর্তী সরকার যেসব কমিশন গঠন করেছে, সেগুলোর দু'একটি বাদে প্রায় সব কমিশনই তার লেখা থেকেই নির্দেশনা নিতে পারে। এসব বিষয়ে তার গভীর অনুসন্ধানী লেখা ও মতামত গত দুই দশকে প্রকাশিত হয়েছে।

এসব বক্তব্য মিজানুর রহমান খানের চতুর্থ মৃত্যুবার্ষিকীর স্মরণসভায় অংশ নেয়া বক্তাদের। শনিবার রাজধানীর মগবাজারে দৈনিক আমাদের বার্তা মিলনায়তনে এই স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়।

সেখানে বক্তারা আরও বলেন, ব্যক্তি মিজান ছিলেন অত্যন্ত সহজ, সরল, সৎ, ব্যক্তিস্বার্থহীন নির্লোভ একজন মানুষ। স্পষ্টভাষী। ছোটবেলা থেকেই কোনো সময়ে কোনো ধরনের স্বার্থপরতার কাজ তার ছিল না। তারই ধারাবাহিকতায় তিনি তার কর্মজীবনে স্বপ্ন বাস্তবায়নের কাজ করেছেন। আমাদের কাছে মিজানুর রহমান খান বেঁচে থাকবেন অনুপ্রেরণা হয়ে।

অনুষ্ঠানে আইন-আদালত, সংবিধান বিষয়ে সাংবাদিকতায় মিজানুর রহমান খান স্মৃতি পুরস্কার প্রণয়নের ঘোষণা দেন সাবেক শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলন।

অনুষ্ঠানে আরও ছিলেন বাংলাদেশ অধ্যক্ষ পরিষদ সভাপতি ও খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর মোহাম্মদ মাজহারুল হান্নান, মিজানুর রহমান খানের ঘনিষ্ঠ বন্ধু খালিদুর রহমান খান, ক্যাডেট কলেজের সাবেক শিক্ষক মাছুম বিল্লাহ, টিচার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ট্যাব) সভাপতি অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান গাজ্জালী, সিনিয়র সাংবাদিক নোমানুল হক, সাবেক ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল জহুরুল ইসলাম মুকুল, একাত্তর টিভি'র সাংবাদিক শাহনাজ শারমীন, সিনিয়র সাংবাদিক বোরহানুল হক সম্রাট, প্রথম আলোর ফটো সাংবাদিক জিয়া ইসলাম, দৈনিক আমাদের বার্তার ফটো এডিটর বুলবুল আহমেদ, শিক্ষক নেতা গোলাম রসুল সানি, মনোয়ারা সিকদার মেডিকেল কলেজের চিকিৎসক ডা. নন্দিতা খান, ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থী পূরব খান, সাংবাদিক আল মাসুদ নয়ন, মোহনা টেলিভিশনের রিপোর্টার এম আর আসাদ ও নিয়াজ স্বপন।

স্বাগত বক্তব্য দেন মিজানুর রহমান খানের অনুজ দৈনিক আমাদের বার্তার প্রধান সম্পাদক ও দৈনিক শিক্ষাডটকম সম্পাদক সিদ্দিকুর রহমান খান। মিজানুর রহমানের জীবনী পাঠ করেন দৈনিক আমাদের বার্তার সিনিয়র রিপোর্টার সাবিহা সুমি।

সিদ্দিকুর রহমান খান তার বক্তব্যে সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। অনেকেই তাদের ট্যাগ মিজানুর রহমান খানের নামে চাপানোর চেষ্টা করেন উল্লেখ করে তিনি বলেন, সর্বশেষ তিনি যে পত্রিকায় চাকরি করেছেন সেই পত্রিকাও তাকে তাদের সাংবাদিক বলে দাবি করেন। কিন্তু, মিজানুর রহমান ওই পত্রিকায় যোগ দেয়ার আগেই সাংবাদিক ও লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। তার অধিকাংশ দুনিয়া কাঁপানো রিপোর্ট তার আগেই প্রকাশিত। তাকে একভাবে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে।

ড. আ ন ম এহছানুল হক মিলন বলেন, ক্ষণজন্মা পুরুষ মিজানুর রহমান খান। তিনি একজন সেলফ ক্রিয়েটেড পারসন। নিজেকে নিজে তৈরি করেছেন। তিনি আইন নিয়ে পড়াশোনা করেননি। কিন্তু আইন নিয়ে তিনি

গভীরভাবে লিখেছেন। তিনি যুক্তির মধ্যদিয়ে সেন্সরশিপ কেটেছেন। ঠিক যেন ছুরি দিয়ে মাখন কাটার মতো। এই একজনের ক্ষুরধার লেখনী, এটি আমাদের জন্য শিক্ষণীয়। আমরা যারা লিখতে চাই, শিখতে চাই, তাদেরকে মিজানুর রহমান খানকে অনুসরণ করা উচিত। বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার যে কয়টা সংস্কার কমিশন করেছে তার প্রায় সবগুলোর প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও সুপারিশ মিজানুর রহমান খানের বিভিন্ন লেখায় পরিষ্কারভাবে বিবৃত। সেগুলো বর্তমান সরকার কাজে লাগাতে পারছে।

অধ্যাপক মাজহারুল হান্নান বলেন, মানুষের যেসব গুণাবলী থাকা দরকার সেগুলোর অধিকাংশই প্রকাশ পেয়েছে মিজানুর রহমানের ভেতরে। তার লেখাগুলো লিপিবদ্ধ করে স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ করা হোক। আজ মিজানুর রহমান খানের জন্য আমরা কাঁদছি। তার শূন্যস্থান আর পূরণ হবে না।

খালিদুর রহমান খান বলেন, ব্যক্তি মিজান ছিলেন অত্যন্ত সহজ, সরল, সৎ, ব্যক্তিস্বার্থহীন নির্লোভ একজন মানুষ। তিনি কোনো ব্যক্তিগত সুবিধা গ্রহণ করেছেন এটা কেউ প্রমাণ করতে পারবে না। তার পেশাগত জীবনেও আমরা দেখেছি, মিজান এমন এক সভ্যতার পথিকৃত, যিনি লিখে প্রতিবাদ জানানোর কাজটি করেছেন। তিনি বাণিজ্যের ছাত্র থেকে আইনের মানুষ হয়ে উঠেছেন। এ বিষয়ে তিনি স্বশিক্ষিত। তিনি একজন সমাজ সংস্কারক। আমাদের কাছে মিজান বেঁচে থাকবে অনুপ্রেরণা হয়ে। পূর্ববর্তী বক্তার বক্তব্যের সূত্র ধরে মাছুম বিল্লাহ বলেন, মিজানুর রহমান খান সত্যিকার অর্থেই একজন সংস্কারক ছিলেন।

দৈনিক আমর দেশ ১২- ০১- ২০২৫

নতুন বাংলাদেশের সংবিধান নিয়ে কিছু প্রশ্ন

দিলারা চৌধুরী

শেখ হাসিনা প্রবর্তিত দীর্ঘ ১৫ বছরের ফ্যাসিস্ট শাসনের বিরুদ্ধে রুখে ওঠা ছাত্র-জনতার জুলাই-'২৪ অভ্যুত্থানের প্রধান দাবি ছিল, নতুন বাংলাদেশে ফ্যাসিবাদের উত্থান রহিত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা। প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে ইতালি ও জার্মানিতে ফ্যাসিবাদের উত্থানের কারণগুলো ব্যারিংটন মুর তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'Social Origin of Dictatorship and Democracy'-তে প্রাঞ্জলভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন, সমাজে বিভিন্ন শ্রেণিগত দ্বন্দ্ব, সহনশীলতার অভাব, অভিজাত শ্রেণির প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে দমন করে রাখার জন্য শক্তি প্রয়োগ প্রভৃতি একনায়কতন্ত্রের জন্ম দেয় এবং দীর্ঘ সময়ের মাঝে তা ফ্যাসিইজমের জন্ম দেয়। বাংলাদেশে ফ্যাসিইজমের উত্থানের পটভূমিতে আমরা দেখতে পাই নৈতিকতাবিবর্জিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি, সুবিধাবাদী সুশীল সমাজ, জাতীয়তাবাদী বুর্জোয়া শ্রেণির অভাব, শাসকশ্রেণির মধ্যে উগ্র জাতীয়তাবাদী মনোভাব, রাজনীতি ও সামাজিক সংস্কৃতিতে ব্যক্তিপূজার প্রাধান্য, সিভিল-মিলিটারি কুলীনতন্ত্রের বন্ধন, অগণতান্ত্রিক সংবিধান প্রভৃতি।

এই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশে ফ্যাসিবাদ উত্থান রহিতকরণ একটি জটিল প্রক্রিয়া। এ সমাজকে পরিবর্তনে রাষ্ট্রের ভূমিকা অনিস্বীকার্য। তাই ফ্যাসিবাদ রহিতকরণ শুরু করা যেতে পারে দেশে একটি গণতান্ত্রিক সংবিধানের দ্বারা, যে সংবিধানে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করাকে রহিত করা হবে ক্ষমতার ভারসাম্যের মাধ্যমে, যেটি ১৯৭২ সালের সংবিধানে অনুপস্থিত ছিল এবং যার ফলে দেশে ফ্যাসিবাদের উত্থান ঘটেছিল। এই '৭২ সংবিধানকে সংযোজন ও বিয়োজনের দ্বারা একটি গণতান্ত্রিক সংবিধানে পরিণত করার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে অন্তর্বর্তী সরকার ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে সংবিধান সংস্কার কমিশন গঠন করেছে প্রখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ড. আলী রীয়াজের নেতৃত্বে।

সম্প্রতি গণমাধ্যমে সংবিধান সংস্কারের ব্যাপারে ড. আলী রীয়াজ কিছু বক্তব্য দিয়েছেন। তিনি এই সুপারিশমালায় কী লিখেছেন, সেগুলো পুরোপুরি বলেননি। শুধু কিছু চুম্বক পয়েন্ট তুলে ধরেছেন। এই চুম্বক পয়েন্টগুলোর মধ্যে সুপারিশ করেছেন দ্বী-কক্ষবিশিষ্ট পার্লামেন্ট, সত্তরের অনুচ্ছেদ সংস্কার, একজন ব্যক্তি কয়টি মেয়াদ প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন, তা নির্দিষ্ট করে দেওয়া, প্রধানমন্ত্রী একই সঙ্গে দলীয় প্রধান ও সংসদ নেতা হতে পারবেন কি না প্রভৃতি। যে পয়েন্টগুলো তিনি বলেছেন, সেগুলোর মধ্যে রাজনৈতিক দল ও সুশীল সমাজের বেশিরভাগ অংশ যেটা বলেছে, সেটার প্রতিফলন রয়েছে এবং প্রস্তাবিত সুপারিশমালায় ক্ষমতার ভারসাম্য রাখার সুস্পষ্ট নির্দেশনা আছে।

কিন্তু একটা চুম্বক পয়েন্ট খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেছেন, পার্লামেন্ট ও প্রেসিডেন্ট উভয়ই সরাসরি জনগণ দ্বারা নির্বাচিত হবে। এটাতে আসলে তিনি কী অর্থ বোঝাতে চেয়েছেন? কারণ পার্লামেন্টারি সিস্টেমে রাষ্ট্রপতি কখনোই সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হন না। রাষ্ট্রপতি সবসময় অপ্রত্যক্ষ ভোট, অর্থাৎ যারা সংসদ সদস্য রয়েছেন, তাদের দ্বারা নির্বাচিত হয়ে থাকেন বা অন্য কোনো রকম পদ্ধতির দ্বারা। অর্থাৎ রাষ্ট্রপতি সবসময়ই অপ্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। সরাসরি রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়া মানেই সেটা আর পার্লামেন্টারি সিস্টেম থাকে না, তখন সেটা প্রেসিডেন্সিয়াল সিস্টেম হয়ে যায়। যেরকম আমেরিকাতে রয়েছে। আরেকটা সিস্টেমের কথা তিনি বোঝাতে পারেন, সেটা হচ্ছে ফ্রেঞ্চ সিস্টেম যেটা ফিফথ রিপাবলিক বলে পরিচিত। ফ্রান্সে যে সংবিধানটা আছে, সেখানে রাষ্ট্রপতি ও পার্লামেন্ট জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে সরাসরি নির্বাচিত হয় এবং এটাকে সেমি-প্রেসিডেন্সিয়াল সিস্টেম বলা হয়। আমেরিকার মতো পুরোপুরি প্রেসিডেন্সিয়ালও নয়, আবার ইন্ডিয়া বা ব্রিটেনের মতো পার্লামেন্টারিও নয়।

বাংলাদেশে সর্বপ্রথম প্রেসিডেনশিয়াল সিস্টেম চালু করেছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। তবে শেখ মুজিবুর রহমানের প্রেসিডেন্সিয়াল সিস্টেমে তার ক্ষমতা সীমিত করার কোনো পন্থা ছিল না। তিনি সংবিধানে সরকারের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গকে একীভূত করে ফেলেছিলেন, ফলাফল ফ্যাসিইজমের উত্থান। পরবর্তী সময়ে জিয়াউর রহমান পঞ্চম সংশোধনীর দ্বারা পরিবর্তন করে সেটিকে একটি মোটামুটি গণতান্ত্রিক সংবিধানে পরিণত করেছিলেন এবং এটাও ছিল একটা প্রেসিডেন্সিয়াল সিস্টেম। তবে এটা পুরোপুরি আমেরিকা ও ফ্রান্সের প্রেসিডেন্সিয়াল সিস্টেমের মতো ছিল না

সংবিধান সংস্কার কমিশন ১২৩টা সংবিধান পর্যালোচনা করে এই সিদ্ধান্তে এসেছে যে, ভবিষ্যৎ সংবিধানে রাষ্ট্রপতি ও পার্লামেন্ট সরাসরি নির্বাচিত হবে। তাহলে তিনি যদি পার্লামেন্টারি বা প্রেসিডেন্সিয়াল বা সেমি-প্রেসিডেন্সিয়াল সিস্টেমে চলে যেতে চান, তাহলে তাকে সংবিধানকে পুনর্লিখন করতে হবে।

প্রশ্ন হলো কোন জাতীয় প্রেসিডেন্সিয়াল সিস্টেমের কথা তিনি বলতে চাচ্ছেন? বাংলাদেশে সর্বপ্রথম প্রেসিডেনশিয়াল সিস্টেম চালু করেছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। তবে শেখ মুজিবুর রহমানের প্রেসিডেন্সিয়াল সিস্টেমে তার ক্ষমতা সীমিত করার কোনো পন্থা ছিল না।

তিনি সংবিধানে সরকারের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গকে একীভূত করে ফেলেছিলেন, ফলাফল ফ্যাসিইজমের উত্থান। পরবর্তী সময়ে জিয়াউর রহমান পঞ্চম সংশোধনীর দ্বারা পরিবর্তন করে সেটিকে একটি মোটামুটি গণতান্ত্রিক সংবিধানে পরিণত করেছিলেন এবং এটাও ছিল একটা প্রেসিডেন্সিয়াল সিস্টেম। তবে এটা পুরোপুরি আমেরিকা ও ফ্রান্সের প্রেসিডেন্সিয়াল সিস্টেমের মতো ছিল না।

অনেকেই মনে করেন জিয়াউর রহমানের প্রেসিডেন্সিয়াল ব্যবস্থা অনেকটাই ফ্রান্সের প্রেসিডেন্সিয়াল সিস্টেমের মতো ছিল। এখনেও রাষ্ট্রপতি ও পার্লামেন্ট সরাসরি জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হতেন। কিন্তু সেখানে সমস্যা যেটা ছিল সেটা হলো, পার্লামেন্টকে বাইপাস করে রাষ্ট্রপতির কাছে কতগুলো ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল । মানে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার ওপরে পার্লামেন্টের কোনো চেক (Check) ছিল না। সেখানে তাহলে রাষ্ট্রপতি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হয়ে যেতে পারতেন। এরশাদও একই সংবিধানের দ্বারা দেশ চালিয়েছেন। তার পরবর্তী পর্যায়ে ১৯৯১ সালে আবার বাংলাদেশ পার্লামেন্টারি সিস্টেমে ফিরে এসেছিল।

কিন্তু ড. আলী রীয়াজের ভাষ্যে মনে হচ্ছে, তিনি হয়তো পার্লামেন্টারি সিস্টেম ছুড়ে ফেলে প্রেসিডেন্সিয়াল সিস্টেমের কথা বলেছেন। এমন ঘটনা অবশ্য পৃথিবীর অনেক দেশেই ঘটেছে। পরিবর্তিত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনাবলি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে যেকোনো দেশই সিস্টেম পরিবর্তন করে থাকে। যেমন করেছে ফ্রান্স, শ্রীলঙ্কা ও তুরস্ক। এ দেশগুলো পার্লামেন্টারি সিস্টেম ছুড়ে ফেলে দিয়ে প্রেসিডেন্সিয়াল সিস্টেম গ্রহণ করেছে।

তবে মূল বিষয় হলো যখনই রাষ্ট্রপতি ও পার্লামেন্ট সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হবেন তখনই আমরা দুটো পাওয়ার সেন্টার বা কেন্দ্রবিন্দু তৈরি করব। এই কেন্দ্রবিন্দুগুলো কীভাবে একে অপরকে চেক করবে, সেটাই দেখার বিষয়। যেরকম আমেরিকায় রাষ্ট্রপতি ও কংগ্রেস (আইন সভা) সরাসরি নির্বাচিত হয় এবং সেখানে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাকে চেক করে কংগ্রেস। কংগ্রেসের ভেতরে আবার উচ্চকক্ষ (সিনেট) ও নিম্নকক্ষ (হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভ) একে অপরকে চেক (check) করে এবং রাষ্ট্রপতিকে চেক করে। রাষ্ট্রপতি আবার কংগ্রেসের অনেক ক্ষমতাকে চেক করে। জুডিশিয়ারি আবার রাষ্ট্রপতি ও কংগ্রেসের ক্ষমতাকে চেক করে। এরকম বিস্তারিত চেক অ্যান্ড ব্যালেন্সের (check and balance) দ্বারা রাষ্ট্রের প্রতিটি অঙ্গের ক্ষমতা সীমিত করে রাখা হয়।

কিন্তু ফ্রেঞ্চ সিস্টেমে এটা অনেকটা ওভারল্যাপিং। যেরকম রাষ্ট্রপতি ও পার্লামেন্ট সরাসরি জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হয় ঠিকই, কিন্তু এটি প্রেসিডেন্সিয়াল ও পার্লামেন্টারি সিস্টেমের একটি সম্মিলন। কিন্তু ফ্রান্সের কনস্টিটিউশনে বিভিন্ন উপায়ে বা বিভিন্ন মেকানিজমের দ্বারা তারা রাষ্ট্রপতি ও পার্লামেন্টের পরস্পরের ক্ষমতাকে সীমিত করে রাখে। এছাড়া ফ্রান্সের সংবিধানে অনেকগুলো কনস্টিটিউশনাল বডি এক্সিকিউটিভকে কন্ট্রোল বা নিয়ন্ত্রণ করে। গভর্নমেন্টটা চালায় পার্লামেন্ট, যেখানে একজন প্রাইম মিনিস্টার আছে, একজন কাউন্সিল অব মিনিস্টার আছে। তারাই গভর্নমেন্টের সবকিছু চালায়। এছাড়া রাষ্ট্রপতিকে অনেক ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, যেটার দ্বারা রাষ্ট্রপতি ফ্রান্সের মূল অনেকগুলো পলিসি, অর্থাৎ ফরেন পলিসি থেকে শুরু করে জাতীয় নীতিমালা প্রভাবিত করতে পারে। জিয়াউর রহমানের প্রেসিডেন্সিয়াল সিস্টেমটা অনেকটা ফ্রান্সের প্রেসিডেন্সিয়াল সিস্টেমের মতো ছিল। সেখানে পার্লামেন্ট ছিল, রাষ্ট্রপতিও ছিল। কিন্তু পুরোপুরি ফ্রান্সের মতো ছিল না। জিয়াউর রহমানের কনস্টিটিউশনে রাষ্ট্রপতি পার্লামেন্টকে কন্ট্রোল করতে পারতেন, যেটা ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি পারেন না। এসব ক্ষেত্রেই সংবিধান রচনাকারীদের ভাবনা ছিল একটি স্থিতিশীল কিন্তু জবাবদিহিমূলক সরকার তৈরি করা।

মূল কথা হলো যে, যদি ড. আলী রীয়াজ প্রেসিডেন্সিয়াল সিস্টেমের কথা ব্যক্ত করে থাকেন, তাহলে কি তার চিন্তাধারা যুগান্তকাল ধরে চলা সংবিধানের রচনাকারীদের সামনে জটিল সমস্যা—কেমন করে একটি স্থিতিশীল সরকার ও একই সময়ে ক্ষমতার ভারসাম্য এনে ফিক্সড টার্ম রাষ্ট্রক্ষমতার চালিকাশক্তিকে সীমিত করে রাখার সমাধান খোঁজা।

যদি সেই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি প্রেসিডেন্সিয়াল সিস্টেমের কথা বলেন, তাহলে তো সংবিধান পুনর্লিখন করতে হবে। পুনর্লিখন করলে তিনি কোন মডেলটা ফলো করতে যাচ্ছেন? আমেরিকান মডেল নাকি ফ্রান্স মডেল? নাকি অন্য কোনো মডেল এখানে আনতে চাচ্ছেন? এ ব্যাপারগুলো পরিষ্কার করে দিলে জাতি উপকৃত হবে।

লেখক: রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও রাজনীতি বিশ্লেষক

দৈনিক যুগান্তর ১২-০১-২০২৫

দেশ সংস্কারের পাদটীকা

ড. হাসনান আহমেদ

প্রকাশ: ১২ জানুয়ারি ২০২৫, ১২:০০ এএম

সরকারি অনেক বিভাগের সংস্কারসংক্রান্ত খসড়া রিপোর্ট তৈরি শেষ হতে চলেছে। আমরা অপেক্ষায় আছি। শেষ ভালো যার, সব ভালো তার। কতটুকু ভালো হবে, সেখানেই সন্দেহ। ‘সংস্কার’ শব্দটা অনেকে সহজভাবে উচ্চারণ করেন, আমি কিন্তু অসুবিধায় পড়ে যাই। বানানটাও বিদঘুটে। বানানে ‘ষ’ হবে, না ‘স’ হবে-এ ঘোর আজও পর্যন্ত আমার গেল না। তবুও অনেক বছর পর এবার অনেক জায়গায় শব্দটি অনেকবার লিখেছি।

Advertisement

সংবিধান সংস্কার ও শিক্ষা সংস্কার নিয়ে অনেক হেদায়েতি বয়ানও পত্রিকায় লিখে পেশ করেছি, সরাসরিও পাঠিয়েছি। আমার হেদায়েত-বার্তা সংশ্লিষ্ট সংস্কার কমিটির পছন্দ হবে, এখনো বোধগম্য নয়। শুনে একটা বিষয় ভালো লেগেছে, স্থানীয় সরকার নির্বাচনে ‘মার্কা’ না থাকার প্রস্তাব। বিষয়টি পরিষ্কার হয়নি।

জানার বিষয় আছে, রাজনৈতিক দলের নামটি প্রার্থীর নামের সঙ্গে থাকবে কিনা। আমি লিখেছিলাম, স্থানীয় সরকার নির্বাচন নির্দলীয়ভাবে হওয়া প্রয়োজন। ‘পরনেওয়ালা ভালো জানে, জুতাটা কোথায় বিঁধছে’। আমি গ্রাম-গঞ্জের মানুষ বিধায় বাস্তবতা বুঝেই বলেছিলাম-চাল-গম, সুযোগ-সুবিধা বণ্টন ও গ্রাম্য সালিশে রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্ব দেখে। এতে সমাজ পুরোপুরি রাজনৈতিকভাবে বিভক্ত হয়ে গেছে।

পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষে সমাজ ভরে গেছে। জনসাধারণকে রাজনীতিসচেতন করতে গিয়ে রাজনীতির বিকৃত রূপ বিয়েবাড়িতে, বাসরঘরে, খেতে-খামারে, এমনকি গরুর হাট পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। আজকাল তো রাজনৈতিক স্থানীয় সরকারের কর্মে পক্ষপাতিত্ব ছাড়াও টাকার গন্ধ শোঁকা পুরোদমে চলছে। কোথাও আটকে গেলে ওপর মহলের দলীয় লোকজন রক্ষা করে। ‘তুমভিও কাঁঠাল খাইয়া, হামভিও কাঁঠাল খাইয়া’।

কর্মের মাঠে, অফিস-আদালতে দল পরিবর্তন হয়েছে, টেবিলের পেছনে মানুষ তো কেউ না কেউ আছে; সিস্টেমও রয়ে গেছে। নির্দলীয় নির্বাচন, আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগ ও রাজনীতিকদের সদিচ্ছা ছাড়া এসব কায়েমি বন্দোবস্ত থেকে নিস্তার পাওয়া অনেক দুরূহ। শোষণমুক্ত ও বৈষম্যহীন সমাজ গড়াও এক্ষেত্রে কল্পিত ধারণাই থেকে যাবে।

কোনো রাজনীতিকের মুখে 'আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে' এবং 'নেতাকর্মীদের মধ্যে সততা থাকতে হবে'-এমন কথা কি ঘুণাক্ষরেও শোনা যায়? এদেশে খুব কম রাজনীতিক আছেন, যাদের মধ্যে 'সততা' শব্দটা অন্তর্নিবিষ্ট হয়ে আছে। ছোট-বড় অধিকাংশ নেতাকর্মীর কেউই আদর্শের কারণে রাজনীতি করেন না; মুখে যা-ই বলুক, ধান্দা ভিন্ন। মূল উদ্দেশ্য ক্ষমতার ভাগীদার হওয়া ও আর্থিক সুবিধার মালিক হওয়া। বুঝি, দীর্ঘদিনে অভ্যস্ত দুর্নীতির এ মচ্ছব থেকে সহজে পরিত্রাণ পাওয়ার নয়। কামার যা গড়ে, মনে মনে গড়ে; গড়ার পরে বোঝা যায়-কী হলো। এ নিয়ে বেশি কথা বললে কোনো কোনো পক্ষ হেই হেই করে তেড়ে আসতে পারে, তখন জীবন বাঁচানো দায়। আমরা কাজে দেখতে চাই। কাজেই বা কতটুকু দেখব অনুমান করতে পারি। উঠন্তি মুলো তো পত্তনেই মোটামুটি চেনা যায়। আমাদের স্বভাব হলো, 'পরের বেলায় মুচকি হাসি, নিজের বেলায় চুপটি আসি'। সেজন্যই সংস্কারের ফল নিয়ে ধন্দের মধ্যে আছি। একমাত্র দলীয় জবাবদিহিতা ও আইনগত দায়বদ্ধতা চলতি এ অবস্থা থেকে কিছুটা হলেও রক্ষা করতে পারে। সে কাজ সংস্কারের মধ্যে কতটুকু হচ্ছে? রাজনৈতিক সংস্কারে ক্ষমতাসীন ও বিরোধী দলের জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতার কথা অনেক পত্রিকায়ও লিখেছিলাম। আমার দৃষ্টিতে এটাই সংস্কারের একটা প্রধান দফা হওয়া উচিত। একটা বড় দলে জেলা-উপজেলা, গ্রামে-গঞ্জের নেতাকর্মীদের নীতি-নৈতিকতা না থাকলে শুধু বড় নেতার মুখের হুমকিতে অকাজ-কুকাজ থেকে কাউকে নিবৃত্ত করা যায় না। আমরা এ যুগে রাজনীতির মাঠে খেলতে সঙ্গে নিই পরীক্ষিত দুর্নীতিবাজ, সোশ্যাল টাউটদের; আবার কাজ চাইব সমাজসেবা ও ত্যাগের মহত্ত্ব-তা কি হয়? 'ছাগল ধরিয়া যদি বলো কানে কানে, চরিতে না যেও বাবা ফলের বাগানে'; কোনো কাজ হবে কি? যেমন স্বভাব ও প্রশিক্ষণ, কাজও তেমন হবে। আমার এসব কথা তো আধুনিক (?) সমাজে বস্তাপচা উপদেশ। তাছাড়া রাজনীতির সেরা পদে পরপর দু'বার কেউ থাকলেন কী থাকলেন না, এতে কিছু আসে-যায় না; প্রভাব অতি সামান্য। পরবর্তী সময়ে জনগণের কাছে দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতার ওজর-আপত্তির অভাব হবে না। প্রয়োজন ক্ষমতায় থাকাকালীন জবাবদিহিতা। কার কাছে? অরাজনৈতিক পেশাজীবী নির্বাচকমণ্ডলী কর্তৃক নির্বাচিত রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে বা রাষ্ট্রপ্রধানদের একটা টিমের কাছে। আমি রাষ্ট্রপ্রধান একজনকে না নির্বাচিত করে একটা 'কমিটি'কে নির্বাচনের কথা আগ থেকেই বলে আসছি। অরাজনৈতিক কমিটি হলে ভালো হয়। কমিটির নাম দিয়েছিলাম 'সুপ্রিম কাউন্সিল', অন্য নামও হতে পারে। কারণ রাষ্ট্রপ্রধান জনগণের ভোটে নির্বাচিত হলে যে দল সরকার গঠন করবে, সেই একই দল থেকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। এতে ক্ষমতার ভারসাম্য বিঘ্নিত হবে। আর রাষ্ট্রপ্রধান দলনিরপেক্ষ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। নির্বাচিত টিমের জন্য অরাজনৈতিক পেশাজীবীদের মধ্য থেকে নির্বাচকমণ্ডলী তৈরি করা প্রয়োজন। রাষ্ট্রপ্রধান একজনের তুলনায় একটা কাউন্সিল হলেই দায়িত্ব সুনিশ্চিত করা সহজ। এছাড়া মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার থেকে বেরিয়ে আসাটাই সংগত।

যুক্তরাষ্ট্র বা যুক্তরাজ্য কিসিমের বড় রাষ্ট্র হলে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা চলত, এত ছোট দেশে এ ধরনের আইনসভা ও প্রদেশবিভক্তি জুতসই হবে না। আবার জগাখিচুড়ি শুরু হবে। অনন্তকাল 'ট্রায়াল অ্যান্ড এরোর' চলতে থাকবে। এর তুলনায় 'সুপ্রিম কাউন্সিলের' ধারণা অনেক উন্নত এবং এর মাধ্যমে রাজনৈতিক দলবাজি, দেশ বিক্রির অন্তরস্থিত খায়েশ, দুর্নীতির মহোৎসব ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া অনেক সহজ।

নির্বাহী বিভাগ, আইন বিভাগ ও বিচার বিভাগের ভারসাম্যপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ এ কাউন্সিলের হাতে দেওয়া যেতে পারে। নইলে ১৫ বছর ধরেই তো দেখলাম, সব বিভাগে নিরঙ্কুশ রাজনীতি ঢুকিয়ে একাকার করে ফেলা হয়। এ পদ্ধতি অন্য কোথাও নেই, এ অজুহাত ধোপে টেকে না। 'তত্ত্বাবধায়ক সরকারের' ধারণাও তো অন্য কোথাও ছিল না; আমরা এখন তা প্রতিষ্ঠার জন্য উন্মুখ হয়ে আছি না! দল যত বড়ই হোক, জেলা-উপজেলা ও গ্রাম-গঞ্জের নেতাকর্মীদের অপকর্মের দায়-দায়িত্ব কেন্দ্রীয় নেতাদের দলীয়ভাবে বহন করতেই হবে। আবার

দলীয়ভাবে অপকর্মের জবাবদিহিতা রাষ্ট্রের কাছে করতে হবে। মূলত অপরাজনীতি, 'চাটার দল' নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া যত মজবুত হবে, দেশ তত ভালো চলবে, কারও ওপর বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন নেই; বাস্তবতা তা-ই বলে। নির্বাচনি এলাকায় উন্নয়নের নামে এমপিদের মাধ্যমে আর্থিক বিলি-বণ্টন, কর্মীদের নিয়ে ভাগাভাগি রহিত করতে হবে। শুধু সুষ্ঠু নির্বাচন দেশ গড়তে ব্যর্থ হবে; আগেও আমরা তা দেখেছি।

ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবার জন্য দেশ। নাগরিক হিসাবে সবার সমান অধিকার। এদেশে পদ ও প্রার্থিতা ব্যাপকভাবে কেনাবেচা চলছে, এ থেকে নিস্তার পাওয়ার উপায় কী? সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ বিলুপ্ত করা সহজ, তবে এদেশের প্রথা অনুযায়ী মতামত কেনাবেচা হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়ে যাবে। চোখ কানা হলে যেদিকে তাকাই, সেদিকেই অন্ধকার।

এদেশে রাজনীতির নাম দুরাচারবৃত্তি, প্রতিহিংসা, ক্ষমতার দাপট ও দুর্নীতি; নাকি এসবের অপর নাম রাজনীতি-সব একাকার হয়ে গেছে। সংস্কার করে এ জঞ্জাল মুক্ত করা এতটা সহজ কথা নয়, এ থেকে পরিত্রাণ পেতেই হবে। সেজন্য বিকৃত মানসিকতার রাজনীতিকদের সুস্থ করতে হবে। দুধ ঘোলে রূপান্তর হয়ে গেলে ঘোল থেকে মাখন পাওয়া সম্ভব নয়। সম্ভব না হলে সুশিক্ষিত মানুষদের নতুনভাবে রাজনীতিতে আনার বিধান করতে হবে। সংস্কারে এসব বিধানের দিকে নজর দিতে হবে। নইলে স্বাধীনতার উদ্দেশ্য অর্থবহ হবে না। শুধু তাই নয়, দেশের অবস্থা বেশি খারাপ পর্যায়ে গেলে অর্জিত স্বাধীনতার অমঙ্গলও হতে পারে। কারণ আমাদের অর্জিত স্বাধীনতার উদ্দেশ্য ছিল শোষণমুক্ত ও বৈষম্যমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার বুকভরা আশা। সে কাজের কতটুকু অর্জিত হলো, কাদের ও কী কারণে অর্জিত হলো না, এখন সেই জিজ্ঞাসা। 'বাঘের ভয়ে উঠলাম গাছে, ভূত বলে পেলাম কাছে'। এখন কোথায় যাব? এ কাজের অগ্রগতির জন্য কোনো বিড়ালের মুখ-ভেংচিতে ভয় পেয়ে দূরে সরে গেলে হবে না। করণীয় করে যেতে হবে। অন্তর্বর্তী সরকারের পরাজয় আমরা দেখতে চাই না। যে যেভাবেই সমালোচনা করুক, আমরা চব্বিশের আগস্টের ছাত্র-জনতার সফল আন্দোলনকে বিপ্লবই বলব। আমাদের কিছু ভুলের কারণে বিপ্লব আংশিক হয়ে গেছে, প্রয়োজন ছিল পূর্ণাঙ্গ বিপ্লবের। প্রয়োজনে প্রধান উপদেষ্টা ও বেশ কয়েকজন উপদেষ্টাকে সঙ্গে নিয়ে এখনো একে পূর্ণ বিপ্লবে রূপ দেওয়া যায়। বিপ্লবী চেতনায় দেশপ্রেমী আরও কিছু লোককে যোগ করা যায়। এ অসম্পূর্ণ বিপ্লব ব্যর্থ হলে দেশের স্বাধীনতা বিপন্ন হবে। এজন্য এদেশের রাজনীতিকদের পরিবর্তিত ও দেশ গড়ার অনুকূল চিন্তা-চেতনা সাধারণ মানুষ আশা করে। সে দায়িত্ব তাদের পালন করতে হবে। এক্ষেত্রে কিছু ছাড় দিয়ে হলেও ঐক্য বজায় রাখতেই হবে। যে কোনোভাবে না-সূচক মন্তব্য থেকে দূরে থাকতে হবে। এত বছরের পুরোনো অভ্যাস সহজে ছাড়া যায় না; তবু ছাড়তে হবে। কারণ অনভ্যাসের ফোটা কপাল চচ্চড় করে।

চেয়েছিলাম শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে সামাজিক শিক্ষাব্যবস্থা একসঙ্গে জুড়ে দিতে; উভয়টারই মান বাড়াতে, মানব-আপৎকে মানবসম্পদে রূপান্তর করতে। উভয় শিক্ষাব্যবস্থা অন্য দেশের শিক্ষাব্যবস্থা থেকে আলাদা করে শিক্ষায় এ জাতি-গোষ্ঠীর স্বকীয় সত্তা বজায় রাখতে। এ নিয়ে ও সামাজিক ব্যবসা নিয়ে মডেলও গড়েছিলাম। এ জনমে বাস্তবে প্রয়োগ করে যেতে পারব না বলে মোটামুটি নিশ্চিত হয়ে গেছি। দেখলাম সিলেবাস আংশিক পরিবর্তন হতে, টেক্সটও অনেকটা পরিবর্তন হতে, এসব ভালো উদ্যোগ। কিন্তু শিক্ষা কাঠামো পরিবর্তন হতে দেখলাম না। তাছাড়া সামাজিক শিক্ষার তো কোনো কাঠামোই এ পর্যন্ত হয়নি। দেশের উপযোগী কাঠামো গঠন ও সার্থক বাস্তবায়নের রূপরেখা তৈরিই হচ্ছে মূল কাজ। এ বিষয়ে এ পত্রিকার মাধ্যমেই অনেকবার অনেক কথা বলেছি। একই কথা বারবার বলা বেমানান। এদেশে কোনো নতুন চিন্তা-চেতনা মনোযোগ দিয়ে শোনা ও বিষয়টি নিয়ে ভাবার লোকের বড্ড অভাব। সামাজিক শিক্ষার উন্নতি না হলে দেশের উন্নতি হবে কী করে? এদেশের যত রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক আপদ, সবই তো সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা-ধস ও শিক্ষাহীনতার কারণে।

কথাটা তো আমরা======= বুঝতেই চাই না, ঘোড়ার আগে গাড়ি জুড়ে বসি। সংবিধানে স্থায়ী শিক্ষা কমিশনের ব্যবস্থা রাখার সুপারিশ করেছিলাম। জানি না করা হবে কিনা। পুরো শিক্ষা বিভাগ ও শিক্ষাব্যবস্থা

কো-অর্ডিনেট করা, নীতিনির্ধারণ করা, নীতি বাস্তবায়ন করা, শিক্ষানীতি প্রণয়ন, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, শিক্ষক নতুন নিয়োগ ও অযোগ্যদের বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠানো, শিক্ষকদের জন্য আলাদা পে-স্কেলের সুপারিশ করা ইত্যাদি অনেক কাজই স্থায়ী শিক্ষা কমিশনের মাধ্যমে করার কথা। আমরা দেশের প্রতিটি মূল্যবান বিষয় নিয়ে বিতিকিচ্ছি অবস্থা তৈরি করি। অবশেষে ভোগান্তি সাধারণ মানুষের কাঁধে এসে ভর করে। এতে আমরা অভ্যস্ত হয়ে গেছি।

অধ্যাপক ড. হাসনান আহমেদ : সাহিত্যিক, গবেষক ও শিক্ষাবিদ; জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ

দৈনিক আমার দেশ ১২-০১-২০২৫

ডাটাবেজের তথ্য যাচাইয়ে নির্বাচন কমিশনের আপত্তি

গাজী শাহনেওয়াজ

- নিজ উদ্যোগে অডিট করবে ইসির টেকনিক্যাল টিম
- কমিটি গঠন
- তথ্য ভান্ডারের জন্য ডিআরএস স্থাপন

নির্বাচন কমিশনের (ইসি) সঙ্গে প্রতারণা করে তৃতীয় পক্ষের কাছে তথ্য পাচার করেছিল তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের (আইসিটি) আওতাধীন সংস্থা–বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি)। এবার একই মন্ত্রণালয়ের অধীনে থাকা আরেকটি সংস্থা অডিটের নামে ইসির ডাটা সেন্টারে প্রবেশ করতে চাচ্ছে। ইসির ডাটা সেন্টার কতটা ঝুঁকিমুক্ত তা 'যাচাই' করতে জাতীয় সাইবার নিরাপত্তা এজেন্সি অডিট করতে চায়। তবে নির্বাচন কমিশন এতে আপত্তি জানিয়েছে। তারা বলেছে, নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় তারা ডাটা সেন্টারের সুরক্ষার বিষয়টি যাচাই করবে। নির্বাচন কমিশন ও তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের একাধিক সূত্র এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।

ইসি সূত্রে জানা গেছে, জাতীয় সাইবার নিরাপত্তা এজেন্সি এনআইডির তথ্যভান্ডার যাচাই করার জন্য বেশ কয়েক দিন আগে চিঠি দেয়। পরে তারা এআইডি অনু বিভাগে একটি টিমও পাঠায়। তবে নির্বাচন কমিশন তাদের অডিটের সুযোগ দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। সূত্র জানায়, ইসির দায়িত্বশীল কর্মকর্তারা তাদের বলেছেন, আপনারা কারা চিনি না। সরকারের সংস্থা হলেও তাদের টিমের সদস্যরা সরকারি কি না বা তাদের পরিদর্শনের অনুমোদন আইন সিদ্ধ কি না, সে প্রশ্নও তোলেন ওই কর্মকর্তা। বিষয়গুলো নিশ্চিত না হলে সুরক্ষিত ইসির ডাটাবেজে কাউকে অডিটের অনুমতি দেবেন না বলে সাফ জানিয়ে দেন।

অন্যদিকে জাতীয় সাইবার নিরাপত্তা এজেন্সি কর্তৃপক্ষ বলছে, আইন দ্বারা সিদ্ধ প্রতিষ্ঠান হিসেবে রাষ্ট্রের ৩৫টি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামোগুলোর (সিআইআই) ডাটা সেন্টার কতটুকু সুরক্ষিত বা ঝুঁকিতে রয়েছে, তা দেখা তাদের এখতিয়ারভুক্ত। এর অংশ হিসেবে তারা ইসির ডাটা সেন্টার যাচাই করতে চান। ভিন্ন কোনো উদ্দেশ্যে ইসির ভোটার তথ্যভান্ডার অডিট করতে চাওয়া হয়নি।

উল্লেখ্য, ক্ষমতাচ্যুত শেখ হাসিনার সরকার তার প্রণীত সাইবার নিরাপত্তা আইন, ২০২৩-এর বিধানের বলে ২০২৩ সালে 'জাতীয় সাইবার নিরাপত্তা এজেন্সি' গঠন করে। সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের সাইবার ঝুঁকি ও হুমকির বিষয়ে সতর্কীকরণ ও প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা নিতে এ এজেন্সি গঠন করা হয়। এজেন্সি গঠনের বছরখানেক আগে

পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৪

আমার দেশ স্বাধীনতার কথা বলে

ডাটাবেজের তথ্য যাচাইয়ে

শেষ পৃষ্ঠার পর

সরকার রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক, এবিআর, ডাটা সেন্টার, সচিবালয় ও ইসিসহ ৩৫টি প্রতিষ্ঠানকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামো (ক্রিটিক্যাল ইনফরমেশন ইনফ্রাস্ট্রাকচার-সিআইআই) ঘোষণা করে সরকার। অবশ্য যে আইনের অধীনে জাতীয় সাইবার নিরাপত্তা এজেন্সি গঠন করা হয়েছে সেই বিতর্কিত সাইবার নিরাপত্তা আইন বাতিল করে প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার নতুন করে সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ/আইন প্রণয়নের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

ইসির সূত্রমতে, দুটি সংস্থার এ দ্বন্দ্বের মধ্যে ইসি নিজেরাই এনআইডির ডাটা সেন্টার অডিট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ লক্ষ্যে নিজস্ব কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে কমিটি গঠন করেছে। ডাটা সেন্টারের ঝুঁকি কতটুকু, তৃতীয় কোনো পক্ষ লিংক ব্যবহার করে সেখানে হস্তক্ষেপ করেছে কি না, কিংবা কতটুকু সুরক্ষিত তা নিশ্চিত হতে এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

এর আগে বিগত সরকারের আমলে 'সরকারি ই-সেবা' দেওয়ার নামে নির্বাচন কমিশনের তথ্যভান্ডারের ডেডিকেটেড সংযোগ এপিআই (অ্যাপলিকেশন প্রোগ্রামিং ইন্টারফেস) নেয় বিসিসি। আইন ও বিধি লঙ্ঘন করে ওই সংযোগ ব্যবহার করেই এনআইডির তথ্য বিক্রি করে আসছে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান 'পরিচয়' প্ল্যাটফর্ম। ডিজিকনের মালিকানাধীন ওই প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অবৈধভাবে নাগরিকের তথ্য বিক্রি করে বিপুল পরিমাণ অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। ওই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে পদচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়ের সংশ্লিষ্টতারও অভিযোগ আছে। 'পরিচয়' অ্যাপস ও ওয়েবসাইটটি উদ্বোধনও করেছিলেন জয়। এপিআই দেওয়ার আগে গণভবনে জয়ের সঙ্গে ইসি ও আইসিটি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে একাধিক বৈঠকও হয়েছে। ওইসব বৈঠকে জিডিকনের প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন। এদিকে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও তারা ওয়েবসাইটের শেষে .gov.bd (https://porichoy.gov.bd) ব্যবহার করে। অবশ্য নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধেও নাগরিকের তথ্য সুরক্ষা দেওয়ার পরিবর্তে বিসিসির হাতে তুলে দেওয়ার অভিযোগ করেছে। কোনো ধরনের চুক্তি ছাড়াই ইসি তাদের এপিআই দিয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। পরে অভিযোগ থেকে বাঁচতে বিসিসির সঙ্গে চুক্তি করে ইসি। তবে ক্ষেত্রেও চুক্তি ভঙ্গ করে বিসিসি। পরে শেখ হাসিনার সরকারের পতনের পর বিষয়টি জানাজানি হলে বিসিসির সঙ্গে সেই চুক্তি বাতিল করে ইসি। এদিকে নাগরিকের তথ্য পাচারের অভিযোগে সজীব ওয়াজেদ জয় ও জুনাইদ আহমেদ পলকসহ ১৯ জনের বিরুদ্ধে সাইবার সিকিউটিরি আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

এর আগে ২০২০ সালেও বিলুপ্ত ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি এনআইডির তথ্য যাচাই করতে চেয়ে চিঠি দিয়েছিল। এর জবাবে পাল্টা চিঠি দিয়ে কিছু তথ্য চেয়েছিল ইসি। চাওয়া তথ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হওয়ায় ওই সংস্থাকে অডিট করতে দেওয়া হয়নি। এ ছাড়া আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে আইসিটি মন্ত্রণালয়ের বিরুদ্ধে এনআইডির হুবহু মিরর কপি নিয়ে তা অপব্যবহারের অভিযোগ ওঠে। আলোচনা রয়েছে ওই মিরর কপি প্রতিবেশ কোনো দেশকে সরবরাহ করা হয়েছে। এর আগে ফ্রান্সের কোম্পানি অবার্থুর বিরুদ্ধে ইসির ডাটা সেন্টার যাচাইয়ের নামে তাতে অনুপ্রবেশের চেষ্টার অভিযোগ উঠেছিল। তবে ইসি তাদের ওই সুযোগ দেয়নি। একই ধরনের অভিযোগ ছিল টাইগার আইটির বিরুদ্ধেও।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে জাতীয় সাইবার নিরাপত্তা এজেন্সির মহাপরিচালক আবু সাঈদ মো. কামরুজ্জামান আমার দেশকে বলেন, 'নির্বাচন কমিশনের তথ্যভান্ডার কতটা সুরক্ষিত সেটা যাচাই করতে চিঠি দিয়েছি। সরকারি সংস্থা হিসেবে এটা আমাদের রুটিন ওয়ার্ক। তারা চাইলে নিজেরাও তাদের তথ্যভান্ডারের সুরক্ষার বিষয়টি দেখতে পারে। তবে আইনি সংস্থা হিসেবে আমরা যাচাই করার অধিকার রাখি। সেটাই আমরা করতে চাচ্ছি। এ জন্য তাদের সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় আছি।'

আইসিটি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রতিষ্ঠান বিসিসি আগে প্রতারণা করে ইসির তথ্যভান্ডার থেকে নাগরিকের তথ্য তৃতীয়পক্ষের কাছে বিক্রি করেছে। আপনারাও আইসিটি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি প্রতিষ্ঠান এ কারণে কি তারা অডিট করাতে আপত্তি জানাচ্ছে—এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, কেন আপত্তি জানাচ্ছে, এটা তারাই বলতে পারবে। আমরা আইসিটি বিভাগের অধীনে হলেও স্বতন্ত্র সংস্থা। আমরা এখতিয়ারভুক্ত প্রতিষ্ঠান হিসেবে অডিট করতে চাচ্ছি। কারণ, আইন অনুযায়ী তারা এটা করতে বাধ্য।

সিআইআইভুক্ত ৩৫টি প্রতিষ্ঠানের তথ্য সুরক্ষার বিষয়টি যাচাইয়ের সুযোগ থাকলেও চলতি অর্থ বছরে তারা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান অডিট করেননি বলে জানান এই ডিজি। তারা এ অর্থ বছরে কেবল ইসিকেই চিঠি দিয়েছেন বলে জানান। তবে অন্য প্রতিষ্ঠানেও অডিট করার পরিকল্পনা রয়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন।

জাতীয় পরিচয়পত্র উইংয়ের মহাপরিচালক এ এস এম হুমায়ুন কবির আমার দেশকে বলেন, এনআইডির ডাটাবেজে নাগরিকের তথ্য আমানত হিসেবে ইসির কাছে সুরক্ষিত। এটিতে যে কেউ চাইলে তাদের অডিটের অনুমতি দিতে পারি না। এটি অরক্ষিত কি না, আমরা নিজেরাই তা যাচাই করছি।

বিসিসি আগে ইসির সঙ্গে প্রতারণা করেছে, এবার আইসিটি বিভাগের আরেকটি সংস্থা অডিট করতে চাইছে—এর মধ্যে কোনো যোগসূত্র আছে কি না এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, যোগসূত্র আছে কি না সেটা জানি না না। তবে আমরা হুটহাট কাউকে জনগণের তথ্য যাচাই করার সুযোগ দিতে পারি না।

জাতীয় তথ্য ভাণ্ডারে ডিআরএস স্থাপন

বাংলাদেশ ইসির অধীনে পরিচালিত নাগরিকের তথ্যসংবলিত জাতীয় তথ্যভান্ডারটি রাষ্ট্রীয় সম্পদ, যা কি পয়েন্ট ইনস্টলেশন (কেপিআই) ও ক্রিটিক্যাল ইনফরমেশন ইনফ্রাস্ট্রাকচারভুক্ত (সিআইআই)। নাগরিকের তথ্যনিরাপত্তা ও সহজলভ্যতা নিশ্চিতে ওই ভান্ডারটির ডিজাস্টার রিকোভারি সাইট (ডিআরএস) থাকা জরুরি।

এর আগে গত ১৭ ডিসেম্বর সভা করে সরকারি ডাটা ব্যবস্থাপনা ও আইভি ডাটা সেন্টারের সক্ষমতা বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ সভা করে সব তথ্যভান্ডারকে এক ছাতার নিচে আনার বিষয়ে নীতিগত সিদ্ধান্ত নেয়। সিদ্ধান্তের মধ্যে মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর ও সংস্থা নতুন কোনো প্রকল্পে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় ডাটা সেন্টার তৈরি করতে পারবে না মর্মে সিদ্ধান্ত নেয়। এর আলোকে যেসব প্রকল্পে ডাটা সেন্টারের নামে বাজেট রয়েছে, তা আবশ্যিকভাবে ফেরত নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। একই সঙ্গে স্ব স্ব ডাটা সেন্টারের বদলে সরকারি ডাটা সেন্টারে তথ্য সংরক্ষিত রাখারও নির্দেশনা দেওয়া হয় মন্ত্রিপরিষদের সভায়। এর পরিপ্রেক্ষিতে ইসি গত ৩১ ডিসেম্বর সভা করে ইসি ভোটার জাতীয় তথ্যভাণ্ডারের নামে ডিআরএস স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

দৈনিক কালের কণ্ঠ ১২-০১-২০২৫

আ. লীগের নিবন্ধন থাকবে কি না সময় বলে দেবে

১২ জানুয়ারি, ২০২৫ ০০:০০শেয়ার

এ এম এম নাসির উদ্দিন

আওয়ামী লীগের নিবন্ধন থাকবে কি না এবং আগামী নির্বাচনে দলটি অংশ নিতে পারবে কি না তা সময় বলে দেবে বলে মন্তব্য করেছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিন।

গতকাল শনিবার সকালে ভোটার তালিকা হালনাগাদ ও ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে আয়োজিত মতবিনিময়সভায় সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এই মন্তব্য করেন।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেন, ‘সময় এলে দেখা যাবে কোন কোন দলের নিবন্ধন থাকে। আওয়ামী লীগ নির্বাচনে অংশ নিতে পারবে কি না সময় এলে দেখা যাবে।

সে জন্য কাজ করছে ইসি।’

সিইসি আরো বলেন, ‘স্থানীয় সরকার নির্বাচন নিয়ে কোনো মন্তব্য করতে চাই না। অনেকে এক দিনে নির্বাচন দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। তবে এক দিনে সব নির্বাচন করা কোনোভাবেই সম্ভব না।

’

সিইসি বলেন, ‘আগামী জাতীয় নির্বাচন ইভিএমে হবে না। প্রধান উপদেষ্টার দেওয়া সময় অনুযায়ী নির্বাচন করার জন্য কাজ করছে নির্বাচন কমিশন, যা সুনির্দিষ্ট নীতিমালার মধ্যে দিয়ে হবে। এবার নির্বাচনে প্রবাসীরা অংশ নিতে পারবেন।’